যোগাযোগ
দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দিশারী সংকল্প (বেলতলা পার্ক), বালুরঘাট, তুহিনশুভ্র মণ্ডল, ৯৭৩৩২২৮৯৬৬
জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব, নয়াবস্তি, রাজা রাউত, ৯৪৭৪৪১৭১৭৮

বিজ্ঞান অন্বেষক

মো ঃ ৯৩৩২২৮০৬০২
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর. পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বর্ষ -৬ | সংখ্যা - ৩ | মে-জুন / ২০০৯ | RNI No. WBBEN/03/11192 | দাম ১টাকা

সর্দি

'এলো যে শীতের বেলা।
শুরু হবে নাসা রন্ধ্রে রন্ধ্রে
জল ঝরানোর পালা'?

জনমানসে সর্দির সঙ্গে শীতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই তৈরী থাকুন সামাল দিতে। শীতকালে সর্দির প্রকোপ বেশী হলেও ঠান্ডার সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রমানিত হয়নি। শীতের সময় আমরা ঘরের বাইরে কম সময় থাকি এবং বেশী সময় জনবহুল স্থানে (যেখানে সর্দিগ্রস্ত লোকের উপস্থিতি বেশী) থাকার ফলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংক্রামক ব্যাধিটির নাম সর্দি। এমন কোনো লোক নেই যিনি সর্দিতে বহু শতবার ভোগেননি। যখন ভোগেন কষ্ট পান, তার পরেই ভুলে যান। সর্দির জন্য সতর্কতা কজন মেনে চলেন?

উপসর্গ ঃ নাক দিয়ে জল ঝরা, গলা খুশখুশ (সোর থ্রোট), নাক বন্ধ, হাঁচি, কাশি, কখনো কখনো চোখ লাল হয়, গায়ে ব্যাথা, মাথা ব্যাথা, অগ্নিমান্দ্য (ক্ষিধে কমে যাওয়া), জ্বর জ্বর ভাব, সামান্য জ্বর, ইত্যাদি।

রোগতত্ত্ব ঃ ইংরেজীতে 'কমন-কোল্ড' নামে পরিচিত সর্দি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এটি আমাদের শ্বাসযন্ত্রের ঊর্দ্ধাংশের একটি অসুখ। শতাধিক বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস এই রোগ সৃষ্টি

এরপর 3 পাতায়

চূর্ণী নদীর অস্তিত্ব
কিছু ভাবনা

বাংলাদেশ হয়ে নদীয়াতে প্রবেশ করার পর মাথাভাঙ্গা পাবাখালির কাছে দ্বিধারায় বিভক্ত হয়। একটি চূর্ণী। অন্যটি ইছামতী।

চূর্ণীর গতিপথের বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্যারেট সাহেব লিখছেন — 'The Churni passes in a direction slightly west of south, past Hanskhali & Ranaghat & falls into the Hooghly between Santipur & Chakdaha'.

চূর্ণী একটি ছোট্ট নদী। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীটির দৈর্ঘ্য ৫৮ কিলোমিটার। রেনেলের আমলে চূর্ণীর সঙ্গে মাথাভাঙ্গার কোন যোগ ছিল না। মাথাভাঙ্গার সঙ্গে চূর্ণীর যোগাযোগ সমর্কে রুদ্র জানাচ্ছেন ঃ 'কবে মাথাভাঙ্গার সঙ্গে চূর্ণী যুক্ত হয়েছিল তা বলা কঠিন। সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীতে কোন এক বন্যার সময় মাথাভাঙ্গার একটি স্রোত দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে এসে চূর্ণীর সঙ্গে মিশে যায়।' চূর্ণীর ইতিহাসকে বুঝতে হলে দরকার মাথাভাঙ্গার ইতিহাসকে ফিরে দেখা। ১৯৩৫-৩৬ সালের 'নদীয়া রিভার ডিভিশনের' নথি থেকে মাথাভাঙ্গার সর্বোচ্চ জলের প্রবাহ সম্পর্কে যে তথ্য মেলে তা থেকে বোঝা যায় সেই সময় মাথাভাঙ্গা, জলঙ্গীর সমপরিমাণ জল বয়ে আনত। কিন্তু আরো অতীতকালের ইতিহাস অন্য কথা বলবে। ১৮২৪-২৫ খ্রীঃ মাথাভাঙ্গার উৎস বন্ধ ছিল। কুমারের পূর্বতন উৎস কচিকাটার ৮ মাইল ওপর থেকে একটি শাখা পদ্মা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে কুমারের সাথে মিলিত হতে দেখা যায়। উক্ত শাখার মোহনাটি কুমারের মোহনার ১০-১২ মাইল ওপরে মিলিত হত। পরবর্তী সময়ে এই নদীটি ভাই মারী নদী হিসাবে পরিচিত হয়। ১৮৩২-৩৩ মাথাভাঙ্গা মূলত ভাইমারীর বয়ে আনা জলেই বেঁচে থাকত। ১৮৩২ এর ভয়ঙ্কর বন্যাতে মাথাভাঙ্গার উৎস রাজাপুরের ২.৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরে যায়। রাজাপুর ছিল পদ্মার বাম তীরে। আর ঠিক উল্টো দিকে ছিল মাথাভাঙ্গার উৎস। মাথাভাঙ্গার এই গতিপথ পরিবর্তনে ভাইমারী তার গতিপথ পরিবর্তন করে ফেলে। পরবর্তী সময়ে মাথাভাঙ্গার প্রবাহ পথে প্রবাহিত ৮০ ভাগ জল কুমার দিয়ে বয়ে যেত। ফলে মাথাভাঙ্গার নিম্নভাগে চূর্ণী-ইচ্ছামতীতে শুখামরশুমে জলের যোগান থাকত খুবই কম। এই সময় চূর্ণী বেঁচে থাকত বৃষ্টির যোগান দেওয়া জলে ও কলিঙ্গ, অঞ্জল, বেহুলা, চকাই, ছোট চকাই এর ক্ষীণকম স্রোতে।

এরপর 2 পাতায়

ঘরের ভেতরে দূষণ

বায়ু দূষণের কথা উঠলেই মাথায় আসে কলকারখানা আর যানবাহন থেকে নির্গত নানা বিষাক্ত গ্যাসে পরিবেশের বিষিয়ে ওঠার কথা। কিন্তু যে কথাটা সাধারণভাবে মাথায় আসে না, তা হল ঘরের ভেতরের বায়ুদূষণ। আর এই দূষণের প্রকৃতি ও কুফল অন্যান্য দূষণের তুলনায় মোটেই হেলাফেলার নয়। যেহেতু ৯০ শতাংশ মহিলাই তাঁদের জীবনের বেশিরভাগ সময় বাড়ির মধ্যে কাটান তাই ওইসব মহিলা এবং শিশু ও বয়স্করা ঘরের ভেতরের দূষণে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। ঘরের মধ্যে বায়ু দূষণ ঘটায় এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দূষকের কথা আলোচনা করা যাক।

১. **ধুলিকণা ঃ** ধুলো নেই এমন বাড় বোধহয় একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার কোনও বাড়িকে সম্পূর্ণ ধুলোমুক্ত করাও অসম্ভব। তবে একটু সতর্ক থাকলে ঘরের মধ্যে ধুলোর পরিমাণ কমানো সম্ভব। বাড়িতে আয়না বা মসৃণ কোনও জিনিসের ওপর প্রায়শই দুলো জমতে দেখি। বিছানার চাদর, পর্দা, জামা-কাপড় ঝাড়লেও বাতাসে ধুলো উড়তে দেখি।

এরপর 5 পাতায়

চূর্ণী নদীর অস্তিত্ব

1 পাতার পর

১৮৩৮ খ্রীঃ পর ১৮৪০-৫০, ১৮৫৩-৫৮, ১৮৫৯-৭৪ খ্রীঃ মাথাভাঙ্গার উৎস মুখের এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে। ১৮৮২ সাল নাগাদ মাথাভাঙ্গাকে নাব্য হিসাবে মানচিত্রে আমরা দেখতে পাই। তবে শুখা মরশুমে উৎসমুখের শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা থেকেই যায়।

১৯৩০ সালের 'অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন নদীয়া রিভার্সের' নামাঙ্কিত সরকারী নথিতে চূর্ণী নদীর উপরিভাগের ঢাল বা 'সারফেস স্লোপ' সম্পর্কে লেখা হচ্ছে — 'The surface slopes between Dewanganj & Hanskhali during the rising flood, high flood, falling flood & in dry season are 0.27, 0.25, & 0.26, respectively'.

এছাড়া ১৯৩০ সালে চূর্ণী দিয়ে প্রবাহিত জলের পরিমাণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে পারি ঃ

স্থানের নাম ও তারিখ		প্রবাহিত জলের পরিমাণ (কিউসেক)
হাঁসখালি	—	
২০ এপ্রিল ১৯৩০	—	২৬১
২০ মে ১৯৩০	—	৩৭২
১১ জুলাই ১৯৩০	—	১,১৪৪
১০ আগস্ট ১৯৩০	—	৭,০৯২
২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০	—	৬,৩৫৯
৩০ অক্টোবর ১৯৩০	—	২,০১২
১৬ জানুয়ারি ১৯৩১	—	৬৮৮
১২ মার্চ ১৯৩১	—	৪৩৭

আবার গঙ্গার বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রকাশিত পত্রে প্রকাশ চূর্ণী প্রতিবছর ২০ হাজার কিউসেক জল ও ১৫.৩ লক্ষ টন পলি বয়ে আনে। এ তথ্য থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় ১৯৩০ সালের চূর্ণীতে প্রবাহিত জলের পরিমাণ ও বর্তমানে প্রবাহিত নদীতে জলের পরিমাণ প্রায় একই রয়েছে। কারণ মাথাভাঙ্গাতে জলের যোগান কমে গেলেও যে পরিমাণ জল মাথাভাঙ্গা প্রায় তার পুরোটাই চূর্ণী দিয়ে প্রবাহিত হয়। ইছামতীর উৎস মুখ পাবাখালির কাছে বন্ধ থাকায় মাথাভাঙ্গার জল ইছামতী পায় না। এছাড়াও মাথাভাঙ্গা চূর্ণীর ১৫০০ বর্গকিলোমিটার উপঅববাহিকা রয়েছে। যেখান থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে এসে নদীটিতে পরে। সঙ্গে নিয়ে আসে পলি। যা জমে নদী গর্ভ অগভীর হয়ে পড়ছে। এবার নদীর বিপুল পরিমাণ, প্রায় ১৫.৩ লক্ষ টন পলির দোলাচলটিকে বোঝা দরকার। পদ্মার শাখা মাথাভাঙ্গাতে জোয়ার ভাটা না হলেও মাথাভাঙ্গার দুই শাখা ইছামতী ও চূর্ণীতে জোয়ারভাটা খেলা করে। চূর্ণীর মোহনা থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার ভেতর পর্যন্ত চারঘন্টায় যে জল ঢোকে, পরবর্তী আট ঘন্টায় ভাটার টানে ধীরে ধীরে সে জল নামে। ফলে যে পরিমাণ পলি নিয়ে সে ঢোকে — সেই পরিমাণ পলি নিয়ে ফেরে না। মোহনায় ফেলতে ফেলতে আসে। আরো একটি ব্যাপার রয়েছে। তা হল, নদীর মিষ্টি জলের সঙ্গে সাগরের নোনা জলের মিশ্রণ ঘটলে একরকম রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়, যাকে 'কোয়াগুলেটিন এফেক্ট' বলে। এর ফলে পলি জমাট বাঁধে ও থিতিয়ে পড়ে। ফলে নদীর নাব্যতা ধীরে ধীরে কমে যায়। ব-দ্বীপের নদীগুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পলি নিয়ন্ত্রণ।

দূষণের কবলে নদী

চূর্ণীর ওপরে নির্ভর করে বেঁচে রয়েছে প্রায় ২০ হাজার মৎসজীবী পরিবার। কিন্তু বাংলাদেশের দর্শনা চিনিকলের সারা বছরের জমিয়ে তোলা রাসায়নিক বর্জ্য মাথাভাঙ্গা দিয়ে চূর্ণীর পথে প্রবাহিত হয়। রানাঘাট পৌরসভার সমস্ত নিকাশি নালার জল এই নদীতে এসে মেশে। এমনকি মাছ ধরার সুবিধার্তে বস্তা বস্তা কার্বাইট স্থানীয় মৎসজীবীরা এই নদীর জলে ফেলে। এইরকমভাবেই নদীটি ধীরে ধীরে দূষণের কবেল পড়ছে। বলা ভাল, এখানে নদী ও মানুষের সহাবস্থানটি বিজ্ঞানসম্মত নয়। আর এই দূষণের প্রকৃতি কিরূপ তা বোঝার জন্য প্রয়োজন নদীর জলের 'physico-chemical characteristics' কে বিশ্লেষণ করা। যে কাজটিতে প্রাথমিকভাবে হাত দিয়েছে 'চূর্ণী বাঁচাও' কমিটি।

নদী ব্যবস্থাপন (River Management)

নদী ব্যবস্থাপন বা River Management বিষয়টি একটি বিস্তৃত বিষয়। বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলভিত্তিতে নদী ব্যবস্থাপন পদ্ধতি ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। চূর্ণী গাঙ্গেয় বদ্বীপের নদী। বারবার গতিপথের পরিবর্তন, নদীর শুকিয়ে যাওয়া, প্রচুর পলি বয়ে আনা ইত্যাদি এর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। নদীকে বাঁচাতে হলে তার অববাহিকার উত্তম ব্যবস্থাপন প্রয়োজন। নদীর দৈর্ঘ্য বড় হলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম নদী চরিত্র লক্ষ করা যায়। যা জটিলতা তৈরি করে নদী ব্যবস্থাপনের। যেমন চূর্ণীর ৩৫ কিলোমিটার ভাটির দিকে ভাঙ্গনের তেমন প্রকোপ নেই। কারণ সেখানে জোয়ারভাটা খেলা করে। ফলে প্রাকৃতিক ভাবেই ওই অংশের মাটি বেশি জমাটি। কিন্তু ২২ কিলোমিটার উজানে ভাঙ্গনের প্রবাব প্রকট। বেতনা গোবিন্দপুরে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে ভাঙ্গন হচ্ছে। এখানে ভাঙ্গনের হার ১৫ মিটার প্রতিবছর।

স্বাধীনতার উত্তরকালে ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা মেটাতে কৃষি ব্যবস্থার যেরূপ প্রসার ঘটে, সমান্তরালভাবে সেচ ব্যবস্থার প্রসারও ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের সেচ ব্যবস্থা মূলত ভৌমজল নির্ভর। রাজ্যে প্রায় আট লক্ষাধিক গভীর ও অগভীর নলকূপ সেচের যোগান দেয়। এত নলকূপ যতটা জল ভূগর্ভ থেকে টেনে নেয়, বর্ষায় ততটা পূরণ হয় না। এইভাবে ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে মাটির তলার জলের ভাণ্ডার। অতীতে শুখা মরসুমে এই জল ভাণ্ডার থেকে চুয়ে আসা জলে নদী প্রবাহকে বজায় রাখত। এখন সেই প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে — কমে গেছে নদীর জলের প্রবাহ। তাই নদীর অববাহিকা জুড়ে জলের যোগানকে ঠিক রাখা প্রয়োজন।

পাশাপাশি, unidevelop flood plain এ নদীকে বাঁচানোর জন্য বন্যারও খুব প্রয়োজন। কারণ ছোট ছোট বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করলে নদীর ক্ষতি হয়। এবং বড় বন্যার ভবিষ্যত তৈরি করে। যা প্রভূত ক্ষতি করে মানবকুলের। গুপ্ত (২০০৬) এ বিষয়ে জানাচ্ছেন ঃ

'Successful projects in flood alleviation may destroy flood plains, dimainish habitat quality in channels & alter floral & faunal communities across former wetlands. In extreme

এরপর 3 পাতায়

চুর্নী নদীর অস্তিত্ব

2 পাতার পর

cases of urban rivers this has led to fransforming rivers into lined canals & in some cases rapidly transferring flood waters to rural tracts beyond the city. None of these is desirable & better management of rivers is becoming more & more important.'

আমাদের করণীয়

নদীয়ার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনীতিতে চূর্নী নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এই নদীকে বাঁচিয়ে রাখা খুব জরুরী। এই উদ্দেশ্য নিয়ে কয়েকটি কাজ করা প্রয়োজন।

(১) দূষণের হাত থেকে নদীকে বাঁচানোর জন্য প্রশাসনিক স্তরে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে ভারতকে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে হবে।

(২) দীর্ঘ নদীপথে পলি অপসারণ সম্ভব নয়। তবে যে সমস্ত স্থানে নদী পলিতে বুজে গেছে সেই সব স্থানে ড্রেজিং করা প্রয়োজন।

(৩) শুখা মরশুমে ভৌম জলস্তর থেকে নদীর জল আসে। তাই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গভীর ও অগভীর নলকূপের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৪) বৃষ্টির জলকে অযথা নষ্ট না করে পুকুর, বাওড়, প্রভৃতিতে ধরে রাখা যেতে পারে। যা নদী অববাহিকার ভৌম জলস্তরকে সমৃদ্ধ করবে।

(৫) নদীকে সজীব রাখার কার্যক্রম ক্রমাগত করে যেতে হবে। প্রকার নদীকে সংস্কার করার পর কয়েক বছরের মধ্যেই নদী পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময় অন্তর বারবার সংস্কারের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। নদীপাড়ের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে এব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিতে হবে।

— সুপ্রতিম কর্মকার, কেরানী পাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, মোঃ ৯৪৭৫৪৩৬২৭৪

ফর্ম IV

রেজিস্ট্রেশন অব নিউজপেপারস (সেন্ট্রাল) রুলস১৯৫৬-এর ৮ম ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে ঃ

১। **প্রকাশ স্থান ঃ** ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা। পিন- ৭৪৩১৪৫

২। **প্রকাশকাল ঃ** দ্বিমাসিক

৩। **প্রকাশক ঃ** জয়দেব দে
৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়

৪। **সম্পাদক ঃ** শিবপ্রসাদ সরদার
কেডিয়াবাগান, জোনপুর, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়

৫। **মুদ্রক** জয়দেব দে
স্ক্রীন আর্ট, ২০, নেতাজী সুভাষ পথ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়

৬। **স্বত্বাধিকারীর নাম ঃ** জয়দেব দে
৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়

আমি জয়দেব দে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

জয়দেব দে
প্রকাশকের স্বাক্ষর
(বিজ্ঞান অন্বেষক)

তারিখ ঃ ৮ মার্চ, ২০০৯

সর্দি

1 পাতার পর

করে। এরা হামেশা বদলানোর (মিউটেশন) ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায়, ভ্যাকসিন তৈরির সম্ভাবনা খুব কম। সর্দির ভাইরাস দুভাবে ছড়ায় ঃ

(১) **নিঃশ্বাস** (এক্সহেলেশন), **হাঁচি ও কাশির সঙ্গে বাতাসে ভাসমান কণা** (এরোসল) হয়ে আশেপাশে যারা থাকে তাদের সবার শরীরে প্রশ্বাসের (ইনহেলেশন) সঙ্গে প্রবেশ করে। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সে সময় কম থাকে তারা রোগাক্রান্ত হয়।

(২) রোগীর নাকের জল বা লালা হাত বা রোগীর ব্যবহৃত অন্য জিনিষের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটে।

প্রতিষেধক ঃ এর কোনো প্রতিষেধক নেই। সবচেয়ে ভাল উপায় সর্দিগ্রস্ত লোকের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখা। নিয়মিত হাত ধোওয়া অনেক অসুখের মত সর্দি ঠেকাতেও কার্যকর উপায়।

সম্ভাব্য জটিলতা ঃ কেবল সর্দি হলে তেমন কোনো জটিলতা হবার কথা নয়। এ অসুখ নিজে নিজেই সারে। মুস্কিল হয় একেই সঙ্গে অন্য ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হলে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলি হলো ঃ ফ্যারিঞ্জাইটিস, সাইনুসাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, মধ্যকর্ণের প্রদাহ ইত্যাদি। যারা হাঁপানীতে ভোগেন, সর্দি তাদের দুর্ভোগ অনেকটাই বাড়িয়ে দিতে পারে। জটিলতার সৃষ্টি হলে চিকিৎসকের শরণ নেওয়া ভাল।

ওষুধ ঃ নিরাময়কারী কোনো ওষুধ নেই। অ্যান্টিবায়োটিকেরও কোনো ভূমিকা নেই। পঞ্চাশ বছর আগে পাঠ্যপুস্তকে ছিল 'এর চিকিৎসা করলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়, না করলে সাতদিন ভুগতে হয়' সেই বেদবাক্য আজও সত্য, সনাতন 'ওয়েট এ্যান্ড ওয়াচ' অর্থাৎ 'অপেক্ষা করুন ও নজর রাখুন' এখনো চালু পদ্ধতি। লবণজলে গার্গল, নাকে লবণজলের ড্রপ (চোখের জলের মত সামান্য নোনতা), ও বিশেষ প্রয়োজনে কষ্টদায়ক উপসর্গ অনুযায়ী বেদনা উপশমকারী ওষুধে কিছু আরাম মেলে। অ্যালার্জিরোধক ওষুধে নাকের জল ঝরা কমে, তবে অনেকের বেশী ঘুম পায়। এ ওষুধ খেয়ে গাড়ী চালানো বা চলন্ত গাড়ির দরজায় ঝোলা বিপজ্জনক।

— ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল, MBBS, DCH, Ph. D. (Medicine), DECD-WHO (Moscow-Alexandria). (m) 9432941929

✆ 25890019(R), 9433977495

Subrata Das

D.M. Club Member Agent, LICI (Kalyani Branch)

: Residence :

Purbasha, Gokulpur, P.O. Kantaganj- 741250

With Best Compliments from

ABHIJIT GHOSH

Kanchrapara

বাঁচার লড়াই

মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এদেশে অন্যপ্রাণের যে সর্বনাশা ডেকে এনেছে তা নিশ্চয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার মত নয়। উন্নত দেশগুলি বন্যপ্রাণের সংরক্ষণে যতটা আন্তরিক আমরা তার কিছুমাত্র নই। কঠোর নিয়মকানুন এদেশে থাকলেও তার প্রয়োগ ও মেনে চলার ব্যাপারে আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন প্রাধান্য পেয়েছে বেশি করে। যদিও কঠোর আইন কানুনের দৌলতে কিছু কুলীন প্রাণী ঝাড়ে বংশে নিধন হবার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বেঁচেবর্তে আছে বটে। কিন্তু বহু অন্যান্য ছোট প্রাণী যাদের নিয়ে আমরা সেভাবে কোন প্রকল্পর বা সংরক্ষণ নীতি চালু করিনি তাদের বাঁচামরা নিয়েও আমাদের উদ্বেগও তেমন ছিল না। তাদের টিকে থাকার বিষয়টি জগৎপালন কর্তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে এরা হেরে তো যায়ই নি বরঞ্চ সাম্প্রতিক চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি এদের বেশ বাড়বাড়ন্তই হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে তাও হয়েছে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যই। যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে গোসাপের সংখ্যা বেড়েছে। সারা দেশের সঙ্গে এ অঞ্চলেও বেড়েছে জনসংখ্যা। ভাগ হয়েছে পারিবারিক জমি। জমি ভাগ করতে গিয়ে দিতে হয়েছে অনেক নতুন আল। গোসাপেরা আলের নিচে গর্ত করে থাকে আর ধরে খায় মেঠো ইঁদুর। বিজ্ঞান দিয়ে ভাবলে দেখা যায় যে হ্যাবিটাট (বাসস্থান) বেড়েছে আর সঙ্গে পর্যাপ্ত খাবার রয়েছে আর জমির ইঁদুর মেরে দেবার জন্যে চাষীরাও এদের বেশ বন্ধু মনে করছেন। তাই এদের অবাধ সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ছে। পুরুলিয়াতে আরো খবর পেলাম। এ জেলার নিতুড়িয়াতে ও তার লাগোয়া অঞ্চলে কয়লা চোরেরা নিজেদের অবৈধ খাদান গোপন রাখার জন্য মৃত গৃহপালিত পশুর ছাল ছাড়ানো দেহ ফেলা রয়েছে খাদানের আশেপাশে। জানা গেল সে মাফিয়ারাও খুন জখমের পর লাশ ফেলে দেয় খাদানে। যাতে পচা মাংসের গন্ধে আর ভয়ে সাধারণ মানুষ এড়িয়ে চলে ঐসব খাদান ভাগাড়। তাই সেখানে নিশঙ্ক হায়নার নির্ভয় দাপট আর পছন্দের খাবার প্রচুর থাকেও। তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ঐ এলাকায় হায়নার হানা বাড়ছে। মাওবাদী, উগ্রপন্থীদের দাপটে অযোধ্যা পাহাড়, ঝাড়খন্ডের লাগোয়া বনাঞ্চল ইত্যাদি অংশে ট্যুরিস্ট কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। ঝোপঝাড় বেড়েছে আর বেড়েছে নেকড়ে। অযোধ্যা পাহাড়ে বিরিংশেরিং, উথুন ডুংরি। ঝিলিঙ্কা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলের আদিবাসীরা জানালেন রাতে তাদের প্রহরা বাড়াতে হচ্ছে বাঁশের টঙে বসে তাড়াতে হচ্ছে নেকড়েদের। এমনকি পুরুলিয়ার কাছে শিমুলিয়ায় শ্মশানে শবদাহ করার সময়েও বেশ সাবধানে থাকতে হয় শবযাত্রীদের। কারণ কাছেই নেকড়েরা জোড়ের জলে (পাহাড়ী ঝরনা বা ছোট জলাধার) গা ভিজিয়ে পাথর বালি মেখে নেয় গায়ে, তারপর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেয়। যাতে বালি আর জলের ছিটেয় আগুন কিছুটা নিভে আসে। আর তড়িৎগতিতে অর্দ্ধদগ্ধ শবদেহ নিয়ে চম্পট দেয়। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে এখানকার অনেকেই পরিচিত। কবর খুঁড়েও নাকি মৃতদেহের ভক্ষনে প্রবৃত্ত হয় এরা, এরকম অভিজ্ঞতার কথাও শোনালেন কয়েকজন।

মালদহের কালিয়াচকে ভারত বাংলাদেশ বর্ডার অঞ্চলে বিএসএফের টহল দেবার জন্য উঁচু রাস্তা তৈরী করতে গিয়ে আশপাশের মাটি কাটায় সেখানে তৈরী হয়েছে বিস্তীর্ণ জলাভূমি। মানুষের অত্যাচার সেখানে নেই। গাঙ্গেয় অববাহিকা বলে নরম বালির স্তরে জলাভূমির পাড় তৈরি হয়েছে। বন্যার সময়ে ঢুকে পড়া অজস্র দেশি গাছ, কাঁকড়া, ব্যাঙ, নির্ভয়ে বংশবৃদ্ধি করছে। পাড়ের গর্তে বাসা বেঁধেছে কচ্ছপরাও। সারস, পানকৌড়ি, মাছরাঙা পাখিরাও প্রচুর। বাস্তুতন্ত্রের নিয়মে রয়েছে সাপ আর বেজিও। এ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি উদ্যোগে সামাজিক বনসৃজনে বেড়েছে গাছপালা। বড় রাস্তার দুধার দিয়ে অসংখ্য গাছ যেমন দেশীয় পাখিদের আবাসস্থল হয়ে উঠেছে তেমনি রায়গঞ্জের কুলীকে এশিয়ার বৃহত্তম 'হেরনরি' বা শামুকখোলদের আস্তানা তৈরী হয়েছে। শামুকখোলের সাথে বাজকা, পানকৌড়ি, বক সহ ১৬৪ প্রকার জাতির পাখি বাসা বেঁধেছে কুলীক নদী বেষ্টিত বনে। পাখিদের সাথে বেড়ে চলেছে সাপ, ব্যাঙ, পোকামাকড়, বেজি, গোসাপ। বনবিড়াল, শেয়াল ইত্যাদি অনেক জীবও। নদীয়া মুর্শিদাবাদ জেলার বাংলাদেশের সীমাঘেঁষা অঞ্চলে বেড়ে চলেছে পাখি, শেয়াল, ভাম, বেজি, তক্ষক সহ বিভিন্ন ধরনের সরীসৃপ আর ব্যাঙ। কৃষিক্ষেত্রের অনেক অংশে জৈব পদ্ধতিতে চাষ হবার জন্যে ব্যাঙ বাড়ছে বলেই মনে হচ্ছে। বর্ষাকালে মাঠে ক্ষেতে ব্যাঙের ডাক শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। নদীয়ার সীমান্তবর্তী করিমপুর সংলগ্ন এলাকায় বেড়েছে শিয়ালের সংখ্যা। এই এলাকা সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ বর্ডারে নো ম্যানস ল্যান্ডে বয়ে চলা নদীর নরম বালির পাড়ের গর্তের ডেরায় নির্ভয়ে শিয়ালেরা বংশবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। নিশ্চিন্তে মিলছে নদীর কাকড়া, মাছ, ঝোপের পাখি, আরও অন্য খাবারও শিয়ালদের বাড়বাড়ন্ত চাক্ষুষ করে এলাম এখানে এক বাড়িতে নেমতন্ন খেতে গিয়ে। একটু রাত হবার পর বিয়েবাড়িতে ফেলে দেওয়া খাবারের আস্তাকুড়ে খাবার খেতে দল বেঁধে হাজির হল ৭-৮টি শেয়াল। দলবদ্ধ শেয়ালদের অনিচ্ছায় জায়গা দিল নেড়ি কুকুরেরা। কারণ মারামারিতে শেয়ালদের সঙ্গে এটে উঠতে পারবে না। হামেশাই এই বন্য শেয়ালদের সন্ধ্যের পর এসব জায়গায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। করিমপুরের পাশে নিউ শিকারপুরে 'নো ম্যানস ল্যান্ডের' গাছপালায় বছর দুয়েক ধরে বিভিন্ন প্রজাতির অসংখ্য পাখি নিয়মিত ভাবে বাসা বাঁধছে। ডিম পাড়ছে। বাচ্চাও ফুটছে তাদের। সীমান্তর ক্ষীরা পরমযত্নে রক্ষা করছেন পাখিদের ডেরা গুলোও।

নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-হুগলী-বর্ধমান ইত্যাদি জেলায় কৃষিজ ফসলের সঙ্গে চাষ হচ্ছে ফুলও। তার জন্যে বেড়েছে মৌমাছি।

এরপর ৪ পাতায়

ঘরের ভেতরে দূষণ

1 পাতার পর

জানালার পাল্লার ফাঁক দিয়ে কিংবা ঘরের চালের কোনও ফুটো দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো ঢুকলে সেখানে ধুলোর উপস্থিতি স্পষ্ট বোঝা যায়। গাড়ি চলাচলের রাস্তার পাশে বাড়ি হলে বাড়িতে দুলোর পরিমাণ বেশি হয়। যেসব বাড়ির মেঝেতে রবারের চাদরের ওপর কার্পেট বিছানো থাকে এবং দেওয়াল রঙ না করা বা দীর্ঘদিন চুনকাম না করা অবস্থায় থাকে সেই বাড়ির মধ্যে ধুলোর পরিমাণ বেশি হয়। বাড়ির আসবাবপত্র নিয়মিত মুছে পরিষ্কার রাখলে, জামা-কাপড়, পর্দা, কার্পেট ইত্যাদি নিয়মিত ধোওয়া হলে, সকাল-সন্ধ্যে ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখলে বাড়ির মধ্যে ধুলোর পরিমাণ কমবে। ধুলোর পরিমাণ বাড়লে শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের প্রদাহ হতে পারে, এমনকি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও হ্রাস পেতে পারে। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন করলেই বাড়ির ভেতরের ধুলোকণা থেকে সৃষ্ট দূষণ অনেকটা রোধ করা যাবে।

২. **ধোঁয়া ঃ** বাড়িতে রান্নাঘরই হল ধোঁয়ার প্রধান উৎস। গ্রামাঞ্চলে রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে কাঠ, পাতা, ঘুঁটে ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এইসব জ্বালানি থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন মনোঅক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন উৎপন্ন হয়। কার্বন মনোঅক্সাইড খুব সহজেই রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়। ফলে কলাকোশে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। এজন্য গ্রামাঞ্চলের মহিলারা শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি শ্বাসতন্ত্রের রোগে বেশি ভোগেন। দীর্ঘসময় এই ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে মাথা ধরা, বমিভাব, গা গুলানো, হৃদরোগ ইত্যাদি হতে পারে। শিশুরাও এই ধোঁয়ায় শ্বাসতন্ত্রের নানা রোগে আক্রান্ত হয়। আবার কয়লা, গুল, কেরোসিন যেসব বাড়িতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেখানে ঘরের মধ্যে পলি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (যেমন বেঞ্জোপাইরিন) ছাড়াও সালফার ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড (NO_2) উৎপন্ন হয়। এগুলো থেকেও শ্বাসতন্ত্রের নানা রোগ, ফুসফুসের ক্যানসার, নাক-চোখে জ্বালা হতে পারে। গ্যাসের উনুনে সামান্য নাইট্রোজেনের অক্সাইড উৎপন্ন হলেও তার পরিমাণ অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় কম। গ্রামাঞ্চলে উন্নত ধরনের ধূমহীন চুল্লি ও গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে এবং রান্নাঘরে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা করলে রান্নাঘরের ধোঁয়ায় বায়ুদূষণ অনেকটা কমবে। সেই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে বাড়ির মধ্যে ধূমপান বাড়ির শিশু, মহিলা ও অন্যান্য অ-ধূমপায়ীদের পক্ষে ভীষণই ক্ষতিকর। পরোক্ষ ধূমপানের ফলে অধূমপায়ীদের মধ্যে ফুসফুসে ক্যানসার ও হৃদরোগের সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মশা তাড়াতে অনেক বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা ডিম রাখার কাগজের ট্রে পোড়ানো হয় বা কয়েল জ্বালানো হয় এবং অনেক বাড়িতে মশা তাড়াতে কিংবা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানোর সময় ধুলো দেওয়া হয়। এগুলোর দহনেও প্রচুর পরিমাণে কার্বন মনোঅক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন উৎপন্ন হয়। শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও মহিলারা এই ধরনের দূষণে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন।

৩. **রাসায়নিক উপাদান ঃ** আজকাল মশার উপদ্রবে প্রায় সব বাড়িতেই মশা তাড়ানোর কয়েল বা তরল ব্যবহৃত হয়। আরশোলা ও অন্যান্য পোকামাকড় তাড়াতেও ঘরের মধ্যে বিভিন্ন কীটনাশক স্প্রে করা হয়। এতে থাকে অ্যালেথ্রিন, প্যালেথ্রিন, পাইরামিন, প্রোপোক্সার ইত্যাদি বিষাক্ত উপাদান। এগুলো থেকে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধা ইত্যাদি রোগ হতে পারে। বাড়ির দেওয়ালে ব্যবহৃত রঙ, আসবাবপত্রে ব্যবহৃত বার্নিশ, রুম ফ্রেশনারের স্প্রে, প্লাইউড, কাগজমন্ডের বোর্ড ইত্যাদি থেকে উদ্ভুত বিভিন্ন রাসায়নিক গৃহভ্যন্তরের বায়ুদূষণ ঘটায়। পুরনো ঘরবাড়ি ও অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া বাড়ির ভেতরের বাতাসে অ্যাসবেসটস, দস্তা ইত্যাদি অজৈব রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। শরীরে এগুলির প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। এগুলির প্রভাবে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ফুসফুসের রোগ, যকৃতের রোগ ইত্যাদি হতে পারে।

৪. **জৈবিক উপাদান ঃ** ঘরের মেঝে ও দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে হলে ঘরের দেওয়াল বা মেঝেতে বিভিন্ন ছত্রাক বাসা বাঁধে। তাদের রেনু ঘরের ভেতরের বাতাসে মিশে থাকে। বাড়ির ভেতর অপরিচ্ছন্ন হলে ইঁদুর, ছুঁচো, মশা, মাছি, আরশোলা ইত্যাদি বাসা বাঁধে। এরাও ঘরের ভেতরের বায়ুতে নানা রোগজীবাণু ছড়ায়। গৃহপালিত কুকুর-বেড়ালের লোম এবং তাদের গায়ে থাকা নানা জীবাণু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট (mite) ঘরের বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। ঘরের মধ্যে কথা, থুতু ইত্যাদি ফেললে তা থেকে নানা জীবাণু ঘরের মধ্যে থাকতে পারে। আবার, বাড়ির সামনে ফল ফুলের বাগান থাকলে পুলের রেণুও হাওয়ায় ভেসে ঘরের মধ্যে হাজির হতে পারে। এগুলির প্রভাবে হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট বা অ্যালার্জি হতে পারে। ঘরদোর নিয়মিত পরিষ্কার করলে এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে ঘরের ভেতরের জৈবিক উপাদানজনিত বায়ুদূষণ দূর করা যাবে। এগুলো ছাড়াও শীতপ্রধান অঞ্চলে ফায়ার প্লেসের ধোঁয়া থেকে ঘরের ভেতরে বায়ুদূষণ হয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় তাপ নিরোধক হিসেবে ফোমের ব্যবহার এবং অ্যাসবেস্টস নিষিদ্ধ হলেও এদেশে হয়নি। ফোম থেকে ফর্মাল ডিহাইড নির্গত হয় যা মাথা ধরা বা বমিভাবের জন্য দায়ী। অনেক বাড়িতে ব্যবহৃত পাথরের মধ্যে তেজস্ক্রিয় র‍্যাডন থেকে যায় যা থেকে ঘরের মধ্যে তেজস্ক্রিয় দূষণও ছড়াচ্ছে। দূষণ নিয়ে পাঠ্যবইতে অনেক কিছু লেখা থাকলেও ঘরের ভেতরের

দূষণ নিয়ে সেভাবে আলোচনা হয় না। পত্রপত্রিকা বা রেডিও-টিভিতেও এ-নিয়ে সেভাবে প্রচার হয় না। অথচ বাড়ির মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এই দূষণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামান্য সচেতনতাই পারে ঘরের ভেতরের দূষণ রোধ করতে।

— সৌম্যকান্তি জানা, ফোন ঃ ৯৪৩৪৫৭০১৩০

পত্রিকা যোগাযোগ

বিজ্ঞান দরবার-কাঁচরাপাড়া, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা, হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম (৯৪৩৪২১২০৪২)। তপন সেন, সেন ফার্মেসী, রেল বাজার আলিপুর দুয়ার জং, জলপাইগুড়ি। কলকাতা বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কল-৭৩। চন্দন রায়/চন্দন সুরভি দাস, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ২/১৪৫, বিজয়গড়, যাদবপুর, কল-৩২। মোঃ ৯৮৩১৬৯৩০৩৮

মহাশূন্যে প্রথম করমর্দন

১৯৫৭-তে মহাকাশ অভিযান প্রথম জয়যাত্রা ছিল রাশিয়ার। তারপর লাগাতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে এসেছে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যে। সাফল্যের কাঁটা একবার এদিকে ঝোঁকে, তবে পরের দফায় পাল্লা ভারি অন্যপক্ষে। বিশবছর আগে, প্রথম এ্যাপোলো সয়ুজ অভিযানে দুই মহাদেশের যৌথ ভূমিকা ছিল। ১৯৮৫-তে নির্মিত রাশিয়ার মহাকাশ স্টেশন 'মির' এর আয়ু ফুরিয়ে এল। ১৯৯৯-তে 'মির' এর পৃথিবীর আবহমণ্ডলে পূর্ণপ্রবেশ ঘটল, তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটার কথা। তাই, রাশিয়া ও আমেরিকার যৌথ চেষ্টা চলছিল এক আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন করে গড়ে তোলা। আজ যা বাস্তবায়িত হয়েছে। যাই হোক, সেবারে বিস্তারিত প্রকল্প। চার সহস্র লক্ষ ডলারের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল, রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই যৌথ উদ্যোগ যেন মহাকাশ মৈত্রী। তবে সাফল্যমণ্ডিত করতে এক নিরলস সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন হুসটন ও লেলিনগ্রাডের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।

ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচশত কিমি উচ্চতায় একশত পনেরো টন ভর বিশিষ্ট রাশিয়ার মহাকাশ নিবাস বনাম গবেষণাগার 'মির' নির্দিষ্ট কক্ষস্থানে ঘুরে চলছিল দশবছর যাবৎ। ২৭শে জুন, ১৯৯৫, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একশত দশ টন ভর বিশিষ্ট মহাকাশ যান 'আটলান্টিস' উড়ে চলল 'মির' এর সন্মিলনে। পরদিন 'মির' এর কক্ষপথের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে, আটলান্টিসকে তাঁর গন্তব্যস্থল থেকে ৬৪,০০০ কিমি দূরত্বে নিয়ে এলেন কমান্ডার গিরসন ও চার্লস প্রিকোর্ট। ক্রমে ক্রমে 'আটলান্টিস' ও 'মির' এর দূরত্ব বন্টন কমতে কমতে ৭৫ মি.-এ দাঁড়িয়েছে, তখন 'আটলান্টিস' এর গতিবেগ ঘণ্টা প্রতি ২৮,০০০ কিমি। অতএব নির্ভুল নিপুণ হস্তকৌশলে শুরু হল দুই মহাকাশ যানের সম্মিলন। গিরসন, আটলান্টিসকে নিয়ে এলেন, একেবারে 'মির' এর সোজাসুজি ৩০ মি. নিচে। এরপর, আর একটু ওপরে উঠে মাত্র ৯ মি. তফাতে রেখে গিরিসন একবার নিখুঁত মহাকাশ বিজ্ঞানীর ভূমিকায় পরখ করে নিলেন। 'মির' এর সোজাসুজি ৩০ মি. নিচে। এরপর, আর একটু ওপরে উঠে মাত্র ৯ মি. তফাতে রেখে, গিরসন একবার নিখুঁত মহাকাশ বিজ্ঞানীর ভূমিকায় পরখ করে নিলেন। 'মির' এর সঙ্গে সংযোগের জন্য 'আটলান্টিস'-এর অবস্থান একেবারে নির্ভুল দিশায় আনানো হয়েছে কি না! উভয় যানের সম্মিলনের প্রাক সন্ধিক্ষণটি যেমনই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সঙ্কটময়। এই প্রাক্‌মুহূর্তটির প্রস্তুতির জন্য মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘ দুই বৎসরের শিক্ষানবিশটি গ্রহণ করতে হয়েছে। মহাকাশ অভিযানের নিয়ন্ত্রকদের। মাত্র কয়েক মিটারের ব্যবধানে হুক শিকল পরস্পর আবদ্ধ হল। প্রযুক্তির এই কার্যকৌশল এতই সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ যে নগণ্য ত্রুটি-বিচ্যুতির অবকাশ রাখা হয়নি। জেট নিঃসৃত গ্যাসের সামান্যতম বিস্ফোরণে ও 'মির' এর সৌর পাখনা ভেঙে পড়তে পারত। গিরসন ও প্রিকোর্ট যদি আটলান্টিস-এর নির্ণীত অবস্থানের দূরত্বে মাত্র ৭ সেমি ওদিক করে ফেলতেন বা নির্ধারিত কৌণিক দূরত্বে ২° ফারাক ঘটে যেত, তবে আটলান্টিস-এর বেমক্কা ধাক্কায় দুটি মহাকাশ যানকেই চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হত। নির্ধারিত তৎপরতায় নভোচরগণ সংযোগ সুড়ঙ্গটি পুরোপুরি বায়ুরোধক হয়েছে কী না তা পরখ করে নিলেন। অতঃপর সুড়ঙ্গের দ্বার দুলে উঠে খুলে গেল। ভারশূন্য অবস্থায় মহাকাশ হাঁটাচলা যায় না, ভাসতে হয়। বায়ুরোধক সুড়ঙ্গে ভেসে এলেন 'মির' এর কমান্ডার ভ্লাদিমির। মহা উচ্ছ্বাসে করমর্দন করলেন আটলান্টিস অধিপতি গিরসনের সঙ্গে। সৌজন্য বিনিময় হল। যুক্তরাষ্ট্রে পক্ষে প্রতীক উপহার হল ফুল-ফল ও ক্যান্ডি, আর রাশিয়ার ক্ষেত্রে চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী অভ্যর্থনার প্রথা হল রুটি ও এক চিলতে নুন দিয়ে স্বাগত জানানো। পৃথিবী থেকে মহাকাশচারীদের অভিনন্দন জানালেন উভয় মহাদেশের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও বোরিস ইয়েলতসিন্। ৭ই জুলাই আটলান্টিস ফিরে এল পৃথিবীর বুকে। ফিরিয়ে আনল আরও কিছু নভোচরকে। গিরসন প্রিকোর্ট ছাড়াও ফিরলেন আরও এক মহাকাশ বিজ্ঞানী ও অন্যতম জ্যোতির্বিজ্ঞানী নর্মাল হাগার্ড, গত তিনমাস যাবৎ যাঁর বাসস্থান ছিল 'মির'। ফিলে এলেন রাশিয়ার আরও দুই নভোচর। তাঁদের জায়গা পূরণ করলেন, যুক্তরাষ্ট্রে দুই মাকাশ বিজ্ঞানী। এই অভিযান যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশকারীদের তিন থেকে ছয়মাস 'মির' এক বসবাস করে, মহাকাশ গবেষণার সুযোগ দিয়েছিল। এর পর নতুন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ESA (ইয়োরোপীয় স্পেস জেন্সি) কানাডা ও জাপান যোগদান করে। ২০০২ খৃঃ থেকে নভোচরগণ এক নাগাড়ে ছয়মাস বা তারও বেশি মহাকাশ সময় কাটাচ্ছেন।

— অনিশা দত্ত,
ফোন ঃ ০৩৩-২৩৩৭২৬৮৭,
৯৮৩১৫৫১৮১৮

লেখিকা পরিচিতি - প্রাঃ অধ্যাপিকা (ফলিত গণিত), বর্ধমান উইমেনস কলেজ, নামী পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখিকা, আকাশবাণী কলকাতায় বিজ্ঞান লেখক, স্কুল পাঠ্য ও কলেজ পাঠ্য পুস্তক, গল্পের বই ও শিক্ষামূলক পুস্তকের রচয়িতা, সম্পাদক ঃ বিজ্ঞানমেলা (সায়েন্স এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল)।

খবর

বার্ড ফ্লু

২১ শে মার্চ, ২০০৯, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে স্থানীয় রামলাল এ্যাকাডেমি হাইস্কুলে 'বার্ড ফ্লু রোগটি কি?' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞানকর্মী জয়দেব দে বার্ড ফ্লু বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর সহ আলোচনা সভাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জেলার বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংগঠনের কর্মীরা ও অন্যান্য বন্ধুরা অংশগ্রহণ করেন। বার্ড ফ্লু রোগটি কি? শীর্ষক একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়।

আধুনিক কৃষিব্যবস্থা এবং পরিবেশ ও স্বাস্থ্য

৫ জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে চিহ্নিত। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে প্রতি বছরই এই দিন সারা পৃথিবীতে সভয়ে উদিত হয় বহু সেমিনার ও আলোচনা সভা। এইসব সভায় আলোচিত হয় কি উপায়ে পরিবেশের সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। পরিবেশ সংকটের জন্য দায়ী আমরাই। সুখের কথা এ বিষয়ে আমাদের সচেতনতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে যে দূষণ নিঃশব্দে আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে সেই কৃষিদূষণ নিয়ে আমাদের ভাবনা চিন্তার কিছু ঘাটতি এখনও আছে। কৃষিতে দূষণের উৎসগুলি জানা থাকা সত্ত্বেও সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা এখনও পর্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারিনি। কে বলতে পারে এই দূষণই একদিন বিশ্বের বৃহত্তম পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হবে না?

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের র গোটা বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ব্যাপক নগরায়ণের সাথে ধ্বংস হতে থাকে পৃথিবীর অরণ্য সম্পদ। একদিকে যেমন প্রাকৃতিক অরণ্য সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে অন্যদিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে জনসংখ্যা। ফলে উৎপন্ন ফসলের চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে চাষাবাদ ক্রমশ উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, সেচের জল এবং নানাপ্রকার কীটনাশক ও ওষুধের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম এগুলির ব্যবহার সীমিত থাকলেও অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বর্তমানে এদের ব্যাপক ব্যবহার ও অপব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে, বাতাস এবং মাটির চেহারা কিভাবে পাল্টাচ্ছে এসব নিয়ে আমরা চিন্তা করিনি। আমাদের মূলমন্ত্র ছিল 'যেন তেন প্রকারেন' কৃষির ফলন বাড়ানো।

চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফলন বাড়াতে গিয়ে আমাদের দেশেও ব্যাপক পরিমাণে উচ্চফলনশীল জাত চাষাবাদে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ফলে ধীরে ধীরে প্রাচীন দেশীয় জাতগুলি হারিয়ে যেতে থাকে। হয়ত এমন দিন আসবে যখন বিভিন্ন প্রকার দেশীয় বীজগুলি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন ইতিহাসের পাতায় এখন 'বালাম চালের' নামে।

আধুনিক চাষাবাসে যেসব উচ্চফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার করা হয় তাতে প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে সার ও জল। পর্যাপ্ত সার ও জলের যোগান দিতে শুরু হল রাসায়নিক সারের ব্যবহার এবং ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলন রাসায়নিক সার হিসেবে মূলত ব্যবহৃত হয় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাস। ইদানীং এইসব রাসায়নিক সারের সঙ্গে কিছু সমুখাদ্যও মিশিয়ে দেওয়া হয়। এগুলি মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন বিয়োজস জীবাণুর বিনাশ ঘটায়। ফলে কৃষি জমির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটছে। অতিমাত্রায় ব্যবহৃত নাইট্রোজেন সম্বলিত সার বিভাজনের মাধ্যমে নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি করে। এগুলি আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রপোস্ফিয়ারে বিষাক্ত ওজোন, স্যালডিহাইড, পারক্লো অ্যামাইড নাইট্রেট তৈরি করে।

কৃষি জমিতে যে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয় তার কিয়দংশ জলে দ্রবীভূত হয়ে পাশের নালাতে এসে পড়ে। নালার জলের সঙ্গে এই সার আশেপাশের জলাশয়ে গিয়ে জমে। জলাশয়ে যে জলজ উদ্ভিদ ও শ্যাওলা থাকে তা এই সারের দরুন অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সূর্যালোকে এই শ্যাওলা অতিরিক্ত অক্সিজেন জলাশয়ে সরবরাহ করলেও মেঘলা দিনে এই শেওলাই জলাশয়ের জল থেকে অতিরিক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করতে থাকে। ফলে অক্সিজেনের অভাবে জলাশয়ের মাছের মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও এই সমস্ত সার কখনো কখনো ভূ-স্তরের মধ্য দিয়ে ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্গে মিশে সেই জলে দূষণ ঘটায়। এই দূষিত জল শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। এই জল পান করলে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হয়। বিশেষ তরে শিশুদের ব্লু বডি বা মিথোমোগ্লোবিনোমা নামে এক ধরনের রোগ হয়। এই অসুখে শিশুর শরীর নীলবর্ণ ধারণ করে। এছাড়াও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং চোখে, নাকে জ্বালা অনুভব করে। এই অসুখে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। রাসায়নিক সারে যে নাইট্রেট থাকে তা শরীরে গিয়ে নাইট্রাইটে রূপান্তরিত হয়। এই নাইট্রাইট প্রাণীদের শরীরে পেশীতে অবস্থিত ক্রিয়াটিনিন-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রো সারকোসিন তৈরি করে, যার প্রভাবে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে।

একই জমিতে বারবার নানা ধরনের ফসল ফলানোর জন্য শুধু রাসায়নিক সারের ব্যবহারই যে বেড়েছে তা নয়, বেড়েছে জলের চাহিদাও। ভূ-পৃষ্ঠে যে পরিমাণ জল পাওয়া যায় তা দিয়ে সবকটি ফসলের সেচের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই মর্তলোক ছেড়ে আমাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পাতাল পুরীতে। ধরনীর বুক বিদীর্ণ করে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসা শুরু হল বিপুল জলরাশি। এই জল উত্তোলনের কোনো হিসেব রাখা হল না। করা হল না কোনো পরিকল্পনা। ফলে যা হবার তাই হল — ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে গেল। জলের সঙ্গে উঠে এল বিষ আর্সেনিক। আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ আক্রান্ত।

অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ফলে সম্প্রতি আরও একটি বিপদ দেখা দিয়েছে। সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে বেহিসেবি জল তোলার ফলে সেখানকার মাটির নিচে সমুদ্রের লবণাক্ত জল প্রবেশ করছে। ফলে চাষের জমি লবনাক্ত হয়ে পড়ছে এবং উর্বরতা শক্তি হারাচ্ছে।

আগেই বলেছি উচ্চফলনশীল জাতগুলোর অধিকাংশই খুব সহজে রোগ ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই এদের রক্ষার জন্য নানাপ্রকার রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। এইসব কীটনাশকগুলি অত্যন্ত মারাত্মক। এরা সাংঘাতিকভাবে পরিবেশকে দূষিত করে। এই কীটনাশকগুলির মধ্যে কয়েকটি হল, ডিডিটি, এইচ সি ডাই এলড্রিন, অনড্রিন, হেস্টাক্লোর ইত্যাদি। এই রসায়নগুলো খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে উচ্চস্তরের খাদকের শরীরে 'বায়োম্যাগনিফিকেশন' ঘটায়। এগুলি খাদ্যের মাধ্যমে জীবের শরীরে প্রবেশ করে, কিন্তু বের হতে পারে না। এই কীটনাশকগুলি মানবজাতির কি সর্বনাশ ডেকে আনছে তা শুনলে আতঙ্কে শিহরিত হতে হয়। এরা খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করায় পুরুষজাতির স্পার্মকাউন্ট কমে যাচ্ছে এবং তারা ধীরে ধীরে

এরপর ৪ পাতায়

বাঁচার লড়াই

4 পাতার পর

প্রজাপতি, ভীমরুল আর বোলতা। প্রজাপতি যেমন বেড়েছে, তেমনি তাদের অপরিণত দশা শুককীট খেকো পাখিদেরও বেশ চোখে পড়ছে ঝোপে ঝাড়ে। মোহনচূড়া, দুপকা, হাজারিকা, দামা, পাপিয়া, চাতক পাখিরা বেড়েছে আগের থেকে। মৌমাছি, বোলতা ধরে খায় আর বাঁশপাতি পাখি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বাঁশপাতি পাখিদের অনায়াসেই চোখে পড়ছে। কৃষিক্ষেত্র, ফুলচাষের জায়গাতে মৌ পালকেরা বসাচ্ছেন কৃত্রিম মৌচাক। বাঁকাপাতিদের তাই বংশবৃদ্ধি ঘটছে বেশি করে। কৃষ্ণনগরের কাছে বাহাদুরপুর ময়লা শোল রিজার্ভ ফরেস্টের লাগোয়া অঞ্চলে এসবের জন্য প্রচুর বাঁশপাতি পাখি ডেরা বেঁধেছে। বন লাগোয়া জাতীয় সড়কের পাশের নয়নজুলির পাড়ের বালি মাটিতে গর্ত খুড়ে বাসা তৈরী করেছে অজস্র। ডিম পেড়েছে, বাচ্চাও ফুটছে, সেই মাটির বাসায় অবলিলায় হানা দিচ্ছে সাপ, বনবিড়াল আর শেয়ালরা। খাদ্যশৃঙ্খলের সূত্র ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে লাল চোখের বেজি।

সরকারের তরফে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়ান ভবঘুরে, যাযাবরদের চরিত্রেরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। তারা স্থায়ী জীবন যাপনের চেষ্টায় আছেন। তার থেকে বড় কথা এদের একটা বড় অংশ শহরমুখী। ফুটপাতবাসীতে পরিণত হয়েছেন। কলকাতা শহর আয়তনে বেড়েছে। এদের থাকার জায়গাও বেড়েছে। এছাড়া রেলস্টেশন গুলোতেও ডেরা বেঁধেছে এরা। বেড়ে যাওয়া শহরে মানুষের মাংসের চাহিদা মিটিয়েছে ব্রয়লার মুরগি। তার ফেলে দেওয়া নাড়ীভুড়ি ইত্যাদি বিনে পয়সায় গোগ্রাসে করে যাযাবরেরা মাংসের স্বাদ পাচ্ছেন। ফলত ঘুরে ঘুরে বনজঙ্গলে কাঠবিড়ালী, ভাম মারতে প্রবৃত্ত হচ্ছেন না। বিষয়টি দণ্ডনীয় হওয়ায় খুব সহজেও হচ্ছে না। তাই গ্রামেগঞ্জে, আধা শহরে বেড়েছে কাঠবিড়ালী, ভাম ইত্যাদি।

বিভিন্ন মফস্বল শহর সহ শহরতলীর বিবিন্ন অঞ্চলে মানুষের বাড়ী বা রাস্তায় দেবদারু গাছ লাগান হয় অর্নামেন্টাল প্যান্ট হিসাবে সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য। কাঠবিড়ালী, বাদুড়েরা এর ফল খায়। এফলের পুরোটাই তাদের আহার্য, কারণ মানুষ এ ফল খায় না। দেবদারু কাঠ নরম হবার জন্যে একটু পুরোনো গাছে অনেক কোটর, ফোঁকর তৈরী হয়, যাতে ভাম, খটাশ প্রাণী তো থাকেই, পেঁচারাও বাসা বাঁধে। শহরের প্রচুর মানুষের বাড়ী ঘরের ইঁদুর, টিকটিকিরা ভাম, পেঁচাদের খাবারও যোগায়।

বিভিন্ন রেলস্টেশনের শেডে জমায়েত হতে দেখা যাচ্ছে কাকশালিখের সঙ্গে বেঘর চড়াইদেরও। বাড়ীর গঠনশৈলী বদলানোতে, আর অনেকগুলো কারণে এই পাখিটির বিদায় প্রায় নিশ্চিত হতে বসেছিল। কিন্তু জীবনসংগ্রামে সে দিব্যি টিকে গেছে। রেলস্টেশনগুলাতে মানুষের ফেলে দেওয়া খাবারের অংশ প্রচুর, আর রেল লাইনেও ভয় নেই কোন শিকারী প্রাণীর। তাই তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটছে। এদের সংখ্যাধিক্য হয়েছে বলে ভামেরা এখন বেশ কিছু স্টেশনে আস্তানা গেঁড়েছে। শহরতলী, ছোট শহরের আশেপাশে ঝোপঝাড়ে সব থেকে বেশি দেখা যাচ্ছে বুলবুল আর দাতারে পাখিদের। এইসব অঞ্চলে মাছ মাংস ও সবজী বাজারে বর্জ্য ফেলায় সেখানে বেড়েছে প্রচুর চেলা, বিছে আর অন্যান্য পোকামাকড়। এদের খেয়ে বেঁচে আছে বেশকিছু পাখিও।

এইসব প্রাণ যারা সংরক্ষণের তালিকায় প্রাধান্য পায়নি, যাদের নিয়ে মানুষ তেমনভাবে ভাবেওনি, জীবন সংগ্রামে আর অস্তিত্ব রক্ষায় জিতে গেছে অভাবিতভাবে। চোখের সামনে দিয়ে উলটপুরান রচনা করেছে এইসব হারানো মানিকের দল। তাই চারিদিকের বেড়ে চলা জৈববৈচিত্র্যে ধ্বংসের নিষ্ঠুর লীলার মধ্যেও আশান্বিত হবার মত কিছু ঘটনাও ঘটছে। আঁধারে আলোর মত এইসব জীবনসংগ্রামের আরো সাফল্য দেখতে চাই বুকভরা আশা নিয়ে। বর্তমানের সবটুকুই আঁধার নয়।

— ডঃ দেবজ্যোতি চক্রবর্তী,

কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ, নদীয়া, ৯৪৩৪১৪৮৮৫৩

আধুনিক কৃষিব্যবস্থা

7 পাতার পর

বন্ধ্যাত্বের দিকে এগিয়ে চলেছে। এখানেই শেষ নয়। এই রসায়নগুলির প্রভাবে দেখা দিতে পারে একজিমা সহ বিভিন্ন চর্মরোগ, বৃক্ক ও যকৃতের দুর্বলতা এবং ক্যান্সার। ডিডিটি সহ অন্য ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বনজাত কীটনাশকগুলি বর্তমানে সারা বিশ্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঠিকই তবে এতদিন ধরে এই ওষুধগুলি সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হয়েছে তার অবশেষে এখনও প্রকৃতিতে রয়ে গেছে। আমরা কেউই এর কুফলের হাত থেকে আজও পুরোপুরি মুক্ত নই।

কৃষি জমিতে দিনের পর দিন রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগের ফলে অপকারী পোকামাকড়গুলির পরিতেরিাধ ক্ষমতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আরও বেশি পরিমাণে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হচ্ছে। এর বিক্রিয়ায় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে উপকারী পোকামাকড়, পতঙ্গভুক পাখি ব্যাঙ কেঁচো প্রায় বিদায় নিয়েছে। ধান ক্ষেতের জলে একসময় বিভিন্ন প্রজাতির ছোট্ ছোট মাছ পাওয়া যেত। আজ যেসব ইতিহাসের পাতায়।

কীটনাশক প্রয়োগের পর নির্ধারিত সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ফসল বাজারে বিক্রি করা উচিত নয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার আমাদের দেশে এসব নিয়মবিধি মানার কোনো গরজ দেখা যায় না।

পরিশেষে বলি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে। মানুষকে অবগত করতে হবে, আমরা কোন বিভীষিকাময় পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছি। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য সমস্যার প্রকৃত কারণগুলি খুঁজে বের করে সেগুলির মোকাবিলার জন্য জনগণকে সচেতন করা ও সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করা।

— কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯৪৩৩১৪৫১১২

যোগাযোগ – বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো ঃ কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৮৪৬০৭৭৭, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০৯২ ।

সম্পাদক মণ্ডলী – সুরজিৎ পাল, পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, মলিল কুমার শেঠ, চন্দন সুব্রতি দাস, চন্দন রায়, গোপাল কৃষ্ণ গাঙ্গুলি।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত ।

সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। (ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in